নীলকণ্ঠ নজরুল

নীলকণ্ঠ নজরুল

(নাটক)

মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ নজরুল
মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ১৮০ টাকা

Nilkanta Nazrul by Madan Gopal Mukhopadhyay Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2020
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 180 Taka RS: 180 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94900-1-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
এবং
শতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা জাতীয় শিক্ষক
পরম শ্রদ্ধেয়
অগ্রজ ও আপনজন
ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

নান্দীমুখ

উভয় বাংলার প্রিয় কবি ও মানুষ কাজী নজরুল ইসলামের জীবন নাটকীয়তায় পূর্ণ, কিন্তু এই মহা প্রতিভার জীবন নিয়ে কোনো নাটক বিশেষ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আরও অনেকের মতোই নজরুলের কবিতা ও গানের সঙ্গে আমার পরিচয় বাল্য ও কৈশোর থেকেই কিন্তু তাঁর জীবনকাহিনির প্রতি আমার আকর্ষণ মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় সেই ষাটের দশকে। নব্বইয়ের দশক থেকে আমার মনে হতে থাকে নজরুলের জীবন নিয়ে নাটক লেখার কথা। সুদূর বিদেশে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের বড় অভাব, তাই নিজে বারবার কলকাতায় গিয়ে অল্প অল্প করে সংগ্রহ করতে থাকি নজরুলের ওপর লেখা বই ও প্রবন্ধ। সেইসব বই ও লেখা থেকে গ্রহণ করা নির্যাস থেকে তৈরি হয়ে উঠেছে এই নাটকের কাঠামো। নজরুলের জীবনের মূল ঘটনাগুলোকে অবিকৃত রেখে নাটকের চাহিদায় কিছু সংক্ষেপিত করতে হয়েছে। তবু আমার মনে হয়েছে যে অমন বিপুল ও বিচিত্র এক জীবনকে মঞ্চের সময়সীমায় কতটুকুই বা প্রকাশ করা সম্ভব! অন্যদিকে বিভিন্ন আলোচনায় দেখেছি নজরুলের জীবন ও কর্মের বিষয়ে বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে আছে বিশেষ অজ্ঞতা। আশা করি এই নাটক কবির জীবন ও সৃষ্টির প্রতি দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। বিশেষ করে আজকের এই অসহিষ্ণুতার দুঃসময়ে নজরুলের জীবন ও আদর্শ আমাদের সঠিক পথ নির্দেশ করে। এই নাটকে সেই পথের সন্ধান আছে, যেখানে মানুষের পরিচয় মানুষ হিসেবেই সত্য, কোনো বিশেষ ধর্মের পরিচয়ে নয়। নজরুল আমাদের শিখিয়েছেন মানুষকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসতে। এ কথা আমরা বারবারই ভুলে যাই। আশা করি এই নাটক আবার স্মরণ করাবে সেই অমোঘ সত্যকে।

পরিশেষে বলি, আমি আমার নিজস্ব সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন। বিশেষ করে নজরুলের মতো এক চরিত্রকে দর্শকদের কাছে উপস্থাপনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা খুবই সম্ভব। সেই সঙ্গে বলার কথা এই যে বইটির 'সংযোজন' অংশে নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে ব্যবহৃত গানের কথারূপ ও নাট্য-চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যুক্ত করার প্রয়াস আশা করি

পাঠকদের ভালো লাগবে। তবে এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ্য গানগুলোর কথারূপের বিষয় প্রাপ্ত সূত্রগুলোর (গানের তলায়) ওপরই আমাকে ভরসা করতে হয়েছে। এই নাটকের পাঠক ও দর্শকরা আমার এই অক্ষমতাগুলোকে মার্জনা করবেন।

এই গ্রন্থ বাংলাদেশে প্রকাশ সম্ভবই হতো না যদি না সাহিত্যিক বন্ধু দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ও সজল আহমেদ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে না আসতেন। এঁদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই সঙ্গে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের 'কবি প্রকাশনী'র সঙ্গে যুক্ত সবাইকে।

মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০
লসএঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়া

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই নাটকটি লেখার সময় মুসলমান সমাজের বিবাহের দৃশ্য রচনায় সাহায্য করেছেন বেকার্সফিল্ড, ক্যালিফোর্নিয়া-নিবাসী শ্রদ্ধেয়া ইসমাত রহমান। নাটকটি ধৈর্য ধরে শুনে বিভিন্ন আলোচনা ও মন্তব্যে ঋদ্ধ করেছেন লসএঞ্জেলসবাসী কালাচাঁদ ও সুদেষ্ণা শীল, অজিত ও ধ্রুবা বসুরায়, রবিন ও প্রতিমা পোদ্দার। নাটকটি প্রকাশের বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেন লেখক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ পাণ্ডা। চন্দননগরের গল্পমেলার সৌম্যদেব ও অঙ্গনা বসু, গৌর বৈরাগী, অজিত মুখোপাধ্যায় ও অন্যদের অনেক ধন্যবাদ জানাই নাটকটির প্রাথমিক পাঠে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমার স্ত্রী অসিতা (ডলি) বারবার নাটকটি শুনেছেন এবং নানা মন্তব্যে উৎসাহিত করেছেন। পুত্র ইন্দ্র (মিঠাই) কম্পিউটার ব্যবহার করে নানাভাবে আমায় সাহায্য করেছেন। এদের সবাইকে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সৌম্যেন বসুকে যিনি এই নাটকটি বেতারে সম্প্রচারের বন্দোবস্ত করেছেন।

প্রথম দৃশ্য

মঞ্চের দুপাশ থেকে দুটি দল দ্রুতবেগে প্রবেশ করে। দুদলে ছেলে ও মেয়ে থাকবে। মেয়েদের পরনে সাদা শাড়ি, লাল বা সবুজ পাড়। ছেলেদের পরনে সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি বা শার্ট। অনেকের হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা। মুখে স্লোগান, বন্দে মাতরম। ব্রিটিশ রাজ দূর হও, দূর হও, এই স্লোগান দিতে দিতে তারা মঞ্চের মাঝামাঝি এসে একটি বৃত্ত রচনা করে গান ধরে

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে...

দলটি গান গাইতে গাইতে মঞ্চ ছেড়ে চলে যায় এবং একই সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করে দুজন ছেলে।

দুজনেরই পরনে ধুতি। একজনের গায়ে সাদা হাফ শার্ট, অন্যজনের পরনে চেক বা রঙিন হাফ শার্ট। একজনের আর্থিক অবস্থা ভালো, অন্যজন দরিদ্র। এটা বোঝাবার জন্য সাদা শার্ট পরা ছেলেটির পায়ে জুতো এবং মোজা, অন্যজনের খালি পা। জুতো পরা ছেলেটির হাতে একটি পাখিমারা বন্দুক। সে বন্দুকটি নিয়ে পাখি মারার জন্য এদিক-ওদিক তাক করতে থাকে।

সাদা শার্ট পরা ছেলেটি শৈলজানন্দ, রঙিন শার্ট পরা ছেলেটি নজরুল ইসলাম।

নজরুল : শৈলজা, পাখি মারতে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু বন্দুক চালাতে আর টিপ তৈরি করতে দারুণ লাগে।

শৈলজা : দুখু, পাখি মেরেই টিপ তৈরি করতে হয়।

দুখু : কেন? পাখি না মেরে, ওই যে চলো না পেঁপে গাছের পেঁপেগুলোর দিকে টিপ করি।

শৈলজা : বেশ তো, তুমিই মারো প্রথমে।
[দুখু বন্দুক নেয়, পিট করে, তারপর গুলি ছুড়তে ছুড়তে বলে]

দুখু : এই গেল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এই গেল ছোট লাট, আর এই গেল বড় লাট—

শৈলজা : [উঁচু হেসে] আরে পাগল হয়েছ দুখু, তুমি কি এই পাখিমারা বন্দুক দিয়ে ইংরেজকে তাড়াবে?

দুখু : হ্যাঁ, তাই তাড়াব। এই বন্দুক দিয়ে আগে বন্দুক ছোড়াটা রপ্ত করি, নিশানাটা বাগাই, তারপর—

শৈলজা : তারপর?

দুখু : তারপর আমি মিলিটারিতে যোগ দেব। বন্দুক, মেশিনগান, কামান চালাতে শিখব, তারপর দেখো একদিন ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করব।

শৈলজা : ঠিক কথা, আমিও তোমার সঙ্গে যোগ দেব। আমরা দুজনে এক হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওদের এ দেশ থেকে তাড়াব।

দুখু : জানো শৈল, দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্নে আমার রাতে ঘুম হয় না। লড়াই না করে আমাদের উপায় নেই। ইংরেজের কাছেই শিখতে হবে লড়াই করার কৌশল। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।

শৈলজা : তারপর মায়ের মুক্তির জন্য বুকের রক্ত দিতে পিছপা হব না।

দুখু : বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে, কবি কী গানই লিখেছেন। মনে হয় এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি বন্দুক হাতে।

শৈলজা : আমি তো জানতাম তুমি কবিতা লেখো। ভাদু গান, টুসু গান বানাও। গ্রামে গ্রামে গিয়ে গান করো লেটো দলের সঙ্গে।

দুখু : কবিতা তো তুমিও লেখো শৈল, কিন্তু শুধু কলম চালালেই হবে না। দরকার হলে বন্দুক তুলে নিতে হবে কাঁধে। এখন তাই সময় হয়েছে, শুধু গান নয়, মেশিনগানের।

শৈলজা : মেশিনগান? সে তুমি কোথায় শিখবে?

দুখু : তাই তো মিলিটারিতে যোগ দিতে চাই। ইংরেজ সরকারের মিলিটারিতে যোগ দিয়ে তার শত্রুকে মেরে ব্রিটিশের উপকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আমার জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে চাই, ইংরেজের জন্য নয়।

শৈলজা : কিন্তু দুখু, তোমার বাড়িতে তোমার মা বাবা মত দেবেন?

দুখু : না। বাবা তো সেই কবেই বেহেস্তে গিয়েছেন। আর আমার মায়ের কথা বোলো না, আমার বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। রাখতেও চাই না।

শৈল : সেকী! তোমার মায়ের জন্য তোমার মন কেমন করবে না?

দুখু : না করবে না। আমার মা থেকেও নেই। আমার কোনো পিছুটান নেই, আমি পেছনে ফিরে তাকাতে চাই না, আমি সামনে চলতে চাই। কিন্তু শৈল, তোমার বাড়িতে?

শৈলজা : তুমি যেমন তোমার বাবাকে ছোটবেলায় হারিয়েছ, আমিও আমার মাকে হারিয়েছি সেই কোন ছোটবেলায়। এখন বড় হচ্ছি দাদামশাইয়ের বাড়িতে এখানে। আমার দাদামশাই আমার বাবাকে দুচোখে দেখতে পারেন না। তাই বাবার সঙ্গেও আমার দেখা হয় না। আমিও তোমার মতো মা-হারা, ফেলে দেয়া ছেলে। তাই আমারও কোনো পিছুটান নেই।

দুখু : কিন্তু তোমার দাদামশাই তো রায় সাহেব। জাঁদরেল লোক। তিনি কি তোমায় যুদ্ধে যেতে দেবেন?

শৈলজা : আমরা আসানসোল গিয়ে এসডিও সাহেবের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসব, এসডিও সাহেব খাঁটি ইংরেজ, আই সি এস, ওখানে রায়সাহেব কেঁচো।

দুখু : বেশ, তবে চলো কালই যাই আসানসোল। যুদ্ধে আমি যাবই।

শৈলজা : শাবাশ দুখু, আমিও তোমার সঙ্গে যাব যুদ্ধে। শিখব বন্দুক চালাতে, কামান ছুড়তে। তারপর আমরা দুজনে মিলে লড়াই করব ইংরেজের স্বার্থে নয়, ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াতে।

দুখু : বলো, দরকার হলে, দেশের জন্য, জন্মভূমির জন্য, বুকের রক্ত দিতে তৈরি থাকব।

শৈলজা : তৈরি থাকব বুকের শেষ রক্তবিন্দুটি দিতে।

দুখু : তবে শপথ নাও। এসো, এই আমি আঙুল কাটছি, (এই বলে দুখু পকেট থেকে একটি ছুরি বের করে আঙুল কেটে রক্ত ঝরায়।)

[শৈল দুখুর হাত থেকে ছুরিটি নিয়ে নিয়ে বলে : এবার আমার পালা এই কথা বলে সে ছুরিটি নিয়ে তার আঙুল কেটে রক্ত বের করে, তারপর দুজনে দুজনের আঙুলের রক্ত মিলিয়ে বলে]

দুখু ও শৈলজা : এই আমরা রক্তের অক্ষরে শপথ নিলাম আমরা একসঙ্গে লড়ব, একসঙ্গে মরব, এ দেশ থেকে আমরা ইংরেজকে তাড়াব। জয় ভারতমাতার জয়, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম।

[মঞ্চের যে দিকে দুখু ও শৈলজা ছিল সে দিকে আলো নিভে যায়, মঞ্চের অন্যদিকে আলো জ্বলে ওঠে। সেখানে সামনে টেবিল চেয়ার পেতে রায় সাহেব চ্যাটার্জি বসে আছেন। উচ্চপদস্থ আমলার পোশাক। মাথায় পাগড়ি। শৈলজা ও দুখু মিয়া প্রবেশ করে অন্ধকার থেকে মঞ্চের আলোকিত অংশে। শৈলজার পকেটে একটি খাম থাকে।]

দুখু ও শৈলজা : ভেতরে আসতে পারি?

রায় সাহেব : ইয়েস কাম ইন।

[শৈলজা রায় সাহেবকে প্রণাম করতে যায় : দাদামশাই]

রায় সাহেব : [মাথায় হাত দিয়ে] থাক থাক, অফিসে দাদামশাই বলে ডাকা আমার পছন্দ নয়।

[শৈলজা সরে আসে : দুখু এবার প্রণাম করতে উদ্যত হয়]

রায় সাহেব : ঠিক আছে ঠিক আছে, ওই দূর থেকেই। তুমি আবার এই সকাল বেলায় পা ছুঁয়ে দিয়ো না যেন। শুনছি তোমরা নাকি যুদ্ধে যাবে বলে আসানসোল গিয়েছিলে কোর্ট অফিসে?

দুজনে : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রায় সাহেব : (দুখুর দিকে তাকিয়ে) : কী নাম?

দুখু : দুখু মিয়া।

রায় সাহেব : আরে ভালো নামটা কী?

দুখু : নজরুল, স্যার। কাজী নজরুল ইসলাম।

রায় সাহেব : তা, যুদ্ধে যাবার দুর্বুদ্ধি মাথায় ঢুকল কেন?

দুখু : আমরা ভারতের স্বাধীনতা...

রায় সাহেব : থাক থাক, বড় বড় বুলি আওড়াতে হবে না। তা বুদ্ধিটি কার মাথা থেকে এল?

শৈলজা : আমার।

রায় সাহেব : তুমি চুপ করো।

নজরুল : আমার।

রায় সাহেব : বুঝেছি। শুনেছি তো তুমি পড়াশোনায় ভালো ছাত্র। ক্লাসে ফার্স্ট হও, যুদ্ধে গেলে লেখাপড়া শিকেয় উঠবে সেটা বোঝো?

নজরুল : হ্যাঁ।

রায় সাহেব : যদি বেঁচে ফেরো। পেটে বিদ্যে না থাকলে খাবে কী? বাপের জমিদারি আছে?

নজরুল : না।

রায় সাহেব : জানি। সব খবর রাখি। তোমার বাড়িতে তো চরম দুর্দশা, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তুমি বাড়ির বড় ছেলে, তোমার একটা দায়িত্বজ্ঞান নেই? যুদ্ধে যাবে!

শৈলজা : আমরা বন্দুক চালানো শিখতে চাই।

রায় সাহেব : তুমি চুপ করো শৈলজানন্দ। তুমি আমার মেয়ের একমাত্র সন্তান। আমার নাতি। আজ তুমি তোমার স্বর্গত মায়ের মর্যাদা ধুলোতে মিশিয়েছ। বাড়ির অন্দরমহলের কান্নাকাটিতে মন ঠিক রাখা যায় না। এখন তো আর ছেলেমানুষ নও, এটুকু বোধ জ্ঞান নেই।

শৈলজা : দেশের জন্য যুদ্ধে যাওয়া...

রায় সাহেব : চুপ করো। দেশ দেশ করে তোমাদের মাথাগুলো খেয়েছে তোমাদের নেতারা। আগে পরিবার তারপর দেশ। তুমি আমার মুখ পুড়িয়েছ, যেমন তোমার বাবা আমার মুখ পুড়িয়েছে। যেমন বাবা তেমন ছেলে তৈরি হচ্ছ।

শৈলজা : আমার বাবাকে এর মধ্যে আনছেন কেন?

রায় সাহেব : আলবত আনব। তোমার বাবা একটা সাপুড়ে। পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে সাপ ধরে বেড়ায়। সেই ধারা তুমি পেয়েছ। বাউণ্ডুলে হয়েছ।

শৈলজা : আপনি যা-ই বলুন, আমরা যুদ্ধে যাবই। আমাদের কাছে এসডিও সাহেবের চিঠি আছে।

রায় সাহেব : এসডিও সাহেবের চিঠি? কই, দেখি সেই চিঠি?

[শৈল একটি খাম বের করে রায় সাহেবের হাতে দেয়। রায় সাহেব খামটি উল্টে পাল্টে দেখেন। তারপর হতাশ হয়ে চেয়ারে গা এগিয়ে দিয়ে বলেন—]

রায় সাহেব : বেশ! যখন সরকারের চিঠি আছে, আমি আটকাবার কে? যাও—চলে যাও। কালই কলকাতায় গিয়ে আর্মি রিক্রুটিং অফিসে রিপোর্ট করো। আমি আর তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।

[দুজনে পুলকিত হয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। প্রায় উইংসের কাছে যখন তারা পৌঁছেছে তখর রায় সাহেব ডাকেন।]

রায় সাহেব : দাঁড়াও। তোমাদের মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়েছে?

দুজনে : না, না তো, মেডিক্যাল পরীক্ষা তো হয়নি।

রায় সাহেব : ওটা তো লাগবে। দাঁড়াও ডাক্তারকে ডেকে পাঠাচ্ছি। (বেল বাজান। আর্দালি এসে দাঁড়ায়। সেলাম দেয়) যাও ডাক্তার সাবকে বোলাও। [জী সাব, বলে আর্দালি বিদায় নেয়। শৈল ও নজরুল দুজনে দুজনের দিকে তাকায়। এমন সময় ডাক্তার প্রবেশ করেন।]

ডাক্তার : গুড মর্নিং স্যার।

রায় সাহেব : মর্নিং। একটি বিশেষ কারণে আপনাকে ডেকেছি। এই ছেলে দুটি যুদ্ধে যাবে বলে কাল কলকাতায় যাচ্ছে আর্মি রিক্রুটিং অফিসে। এরা ব্রিটিশ সরকারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এদের জন্য আমরা গর্বিত। আমরা এদের সাফল্য প্রার্থনা করি ও এই নব্য যুবকদের, এই দেশের ভবিষ্যৎদের অভিনন্দন জানাই।

ডাক্তার : নিশ্চয় স্যার।

রায় সাহেব : নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধে যাবার আগে এদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা দরকার। সেইটেই হয়নি। আপনার ছাড়পত্র না পেলে তো কিছুই হবে না।

ডাক্তার : নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি এক্ষুনি সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি। দুজনকেই তো স্বাস্থ্যবান বলে মনে হচ্ছে। কোনো অসুবিধে হবার তো কথা নয়।

রায় সাহেব : নিশ্চয়। যেটা কর্তব্য, সেটা তো করতেই হবে—শুধু, (ডাক্তারকে ইঙ্গিত করেন কাছে আসতে। তারপর কানে কানে কিছু বলেন।)

[ডাক্তার ছেলে দুটির দিকে চান। তারপর দুজনের চোখ দেখেন, গলা দেখেন, বুক মাপেন, বুকে স্টেথোস্কোপ বসান। তারপর নজরুলকে দেখিয়ে বলেন]

ডাক্তার : তুমি পাস। মেডিক্যাল ফিট। (এবার শৈলর দিকে চেয়ে বলেন) মাস্টার, তোমার তো যুদ্ধে যাওয়া হবে না। তুমি তো মেডিক্যাল আনফিট।

শৈলজা : (প্রতিবাদ করতে যায়। আমতা আমতা করে বলে) আমার ছাতি তো...

রায় সাহেব : চুপ করো। ডাক্তার সাহেব যা বলছেন তার ওপর কোনো কথা নেই। নজরুল, তুমি কাল কলকাতার ট্রেন ধরবে। শৈল, তুমি বাড়ি থেকে বেরুবে না।

[শৈল ও নজরুল দুজনে দুজনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর দুজনে দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

নজরুল বলে ওঠে]

দে গরুর গা ধুইয়ে!!! বন্দে মাতরম।

শৈলজা : বন্দে মাতরম।

পর্দা নেমে আসে

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটি সাধারণ ঘর। একটি টেবিল, কয়েকটি চেয়ার, মেঝেতে মাদুর পাতা। সামান্য কিছু জিনিসপত্র। বই, লেখার কাগজ, খবরের কাগজ। চায়ের কাপ, বাটি ইত্যাদি।

চেয়ারে একজন যুবক বসে লিখছেন।

তিনজন যুবক প্রবেশ করেন। একজন শৈলজানন্দ, অন্যজন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, আর নজরুল। নজরুলের পরনে মিলিটারি পোশাক। পায়ে বুট জুতো। অন্য দুজনের সাদা ধুতি ও সাদা পাঞ্জাবি। কাঁধে ব্যাগ।

নজরুল : সালাম আলেকুম মুজফফর সাহেব।

মুজফফর : সালাম আলেকুম। আপনি নিশ্চয় নজরুল ইসলাম। আপনার চিঠি পেয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আসুন আসুন। কবে এলেন?

নজরুল : হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, তিন-চার দিন হলো এসেছি কলকাতায়। উঠেছিলাম এই আমার বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দর মেসে।

[শৈলজা ও মুজফফর নমস্কার বিনিময় করেন।]